সাতদিন

২৯ নবেম্বর : আওয়ামী লীগের ওয়াকআউটের মধ্য দিয়ে সংরক্ষিত মহিলা আসন বিল পাস।

রাজধানীর জুরাইন বস্তিতে অগ্নিকান্ডে মা ও দু'সন্তানসহ ৪ জনের মৃত্যু।

৩০ নবেম্বর : র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‌্যাব) একটি দল রাজধানীর পুরানো পল্টনে ১১টি মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠানে। অভিযান চালিয়ে কয়েকটি দেশের প্রায় পৌনে ১ কোটি টাকা মূল্যের মুদ্রা জব্দ করে।

১ ডিসেম্বর : কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিবির কর্মীদের নির্দিষ্ট সংখ্যার অধিক গান গাইতে দেয়াকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের সঙ্গে শিবিরের ব্যাপক সংঘর্ষ।

২ ডিসেম্বর : বিক্ষোভ সমাবেশের মধ্য দিয়ে ৩ পার্বত্য জেলায় শান্তিচুক্তির সপ্তম বর্ষপূর্তি পালিত।

সড়ক দুর্ঘটনায় নাটোরে ৭ এবং গাইবান্ধায় ৬ জন নিহত।

৩ ডিসেম্বর : চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানার যুবদল নামধারী ক্যাডার সজলনাথ র‌্যাবের সঙ্গে সন্ত্রাসীদের বন্দুকযুদ্ধে পড়ে নিহত।

৪ ডিসেম্বর : সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের হামলায় এক ছাত্রদল কর্মী ও তার সহপাঠী আহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত।

কেরানীগঞ্জের বাহেরচরে র‌্যাবের অভিযানকালে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায় সোহরাব নামের এক যুবক। অপর জন নূরুল হককে আহত অবস্থায় ভর্তি করা হয় ঢাকা মেডিকেলে।

৫ ডিসেম্বর : দেড় মাস সফর শেষে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা দেশে ফেরেন।

টঙ্গিতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে শতাধিক বাড়ি ঘর ভস্মীভূত।

miKv‡ii AvšwiKZv _vK‡jB mdj

শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে তিন দিনব্যাপী বিশ্ব ইজতেমা। প্রায় ৪০ লাখ লোকের সমাবেশে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শেষ হয়েছে বিশ্ব ইজতেমা। বিশ্ব ইজতেমায় যাতে কোনো ধরনের নাশকতামূলক ঘটনা না ঘটে, তার জন্য সরকার ছিল বেশ সক্রিয়। সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়।

র‌্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী ৬ হাজার নিরাপত্তাকর্মী সার্বক্ষণিক এই বিশ্ব ইজতেমায় দায়িত্ব পালন করেছেন। র‌্যাব সদস্যরা ডগ স্কোয়াড নিয়ে চষে বেড়িয়েছেন মাঠ। দুটি হেলিকপ্টার রাখা হয়েছিল মাঠ পর্যবেক্ষণের জন্য। ইজতেমায় টাইম বোমা বিস্ফোরণের চেষ্টার অভিযোগে কথিত জনযুদ্ধের দুই সদস্যকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। সপ্তাহব্যাপী বিশ্ব ইজতেমাস্থলে সার্বক্ষণিক টহল অব্যাহত রাখা হয়েছে।

miKv‡ii mô e¨e¯'vcbvi Kvi‡Y †Kv‡bv iKg ANUb QvovB Gev‡ii wek BR‡Zgv m¤úb n‡q‡Q

বিশ্ব ইজতেমায় বিশ্বের ৬০টি দেশের তিন হাজার মুসল্লি এসেছিলেন। মোনাজাতে অংশ নিয়েছে প্রায় ৪০ লাখ মানুষ। আয়োজকদেরও ছিল সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা, ছিল চিকিৎসা টিম। আয়োজক ও সরকারের উদ্যোগে সমন্বয় ঘটানো হয়েছে।

বিশ্ব ইজতেমাকে শান্তিপূর্ণ করতে সরকার প্রথম থেকেই সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ কারণেই কোনো অঘটন ছাড়াই এতো বিশাল মানুষের সমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে শেষ করা সম্ভব হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে সরকার আন্তরিক থাকলে অনেক কাজই নিখুঁতভাবে করতে পারে। কিন্তু সরকার তা করেনি। ব্যর্থতার দায়ভার চাপাতে চায় বিরোধী শিবিরের ওপর।

বিশ্ব ইজতেমার মতো সরকারকে সব বিষয়ে আন্তরিক হতে হবে। একটি সফলতার জয়গান করলেই চলবে না। কারণ জনগণের সমস্যা সমাধানে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। জনগণ ভোটের মাধ্যমে অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে ক্ষমতা দিয়েছে। সরকারের রয়েছে এ ক্ষমতা। প্রয়োজন শুধু একটু আন্তরিকতার।

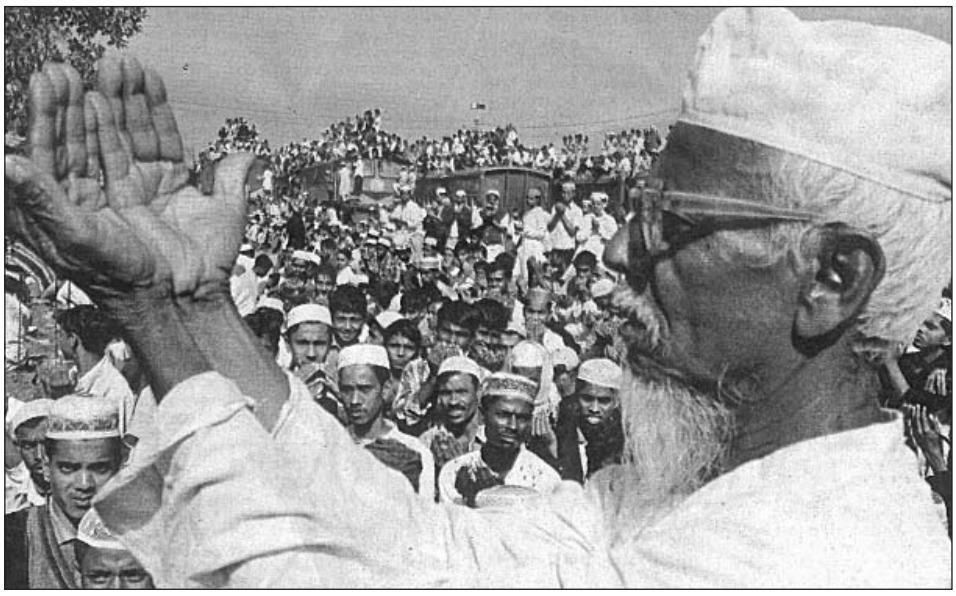

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্র

নেই যোগ্য চিকিৎসক এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম

রিপোর্ট : **রুমানা পপি**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চিকিৎসা কেন্দ্র আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রছাত্রীই জানেন না। কেউ কেউ অনার্স-মাস্টার্স পাস করে বেরিয়ে গেছেন। জানতে পারেননি তাদের চিকিৎসা দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি মেডিকেল সেন্টার চালাচ্ছেন।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোর ছাত্রদের মধ্যে জন্ডিস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে পত্রিকার সংবাদে আসে এই মেডিকেল সেন্টারের কথা। কিন্তু এই মেডিকেল সেন্টারটির বেহালদশা চোখে না দেখলে বোঝার উপায় নেই।

তরিকুল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া হলের ইংরেজি বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র। বেশ কিছুদিন ধরেই জন্ডিসে আক্রান্ত। আর সে কারণেই তিনি ভর্তি হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে। কথা প্রসঙ্গে তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি অনেকটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আছেন বলে জানান। কারণ তিনি তার প্যাথলজিক্যাল টেস্টের রিপোর্ট নিয়ে সন্দিহান। জন্ডিসে আক্রান্তদের বিলুরুবিন এবং লিভারের যে টেস্ট রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে দেয়া হয় তার রিপোর্ট মাত্র ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে দুই জায়গায় দুই রকম এসেছে। জন্ডিস আক্রান্ত ছাত্রদের রক্ত পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টার এবং ওমর সুলতান মেডিকেল সেন্টারের প্যাথলজিকাল বিভাগে করা হচ্ছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই দুই জায়গার টেস্টের রিপোর্ট খুব কম সময়ের ব্যবধানে দুই রকম আসছে। তরিকুলের ব্লাড টেস্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারের পরীক্ষায় বিলুরুবিন ৮.৩ আর ওমর সুলতান মেডিকেলের পরীক্ষায় এসেছে ১৩.৫।

একই ঘটনা তরিকুলসহ অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটছে যার কারণে জন্ডিস আক্রান্ত ছাত্ররা তাদের শারীরিক অবস্থা সত্যিকার অর্থে কেমন সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে পারছেন না। বেশির ভাগ ছাত্রের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া যায় যে, ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টারে প্যাথলজিতে পরীক্ষাকৃত রিপোর্টে বিলুরুবিনের পরিমাণ/রেট যা আসছে তার তুলনায় ওমর সুলতানের প্যাথলজিতে পরীক্ষাকৃত রিপোর্টে বিলুরুবিনের রেট অনেক বেশি আসছে। এখন এটা একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোগীরা কোন রিপোর্টের ওপর নির্ভর করবে? এখানে লক্ষণীয় যে, যেহেতু ইউনিভার্সিটি মেডিক্যাল সেন্টার (UMC) ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনের তুলনায় আধুনিক যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা রয়েছে সে কারণে সঠিক রিপোর্ট আসছে না, নাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারের ভাবমূর্তি নষ্টের প্রচেষ্টা চলছে? তবে অনেকে UMC-এর আধুনিক যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের স্বল্পতাকেই দায়ী করেন। যদিও কাগজে-কলমে ডাক্তারের সংখ্যা অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিও দুটি ইউনিটে ২২ জন কিন্তু কতজন সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন তাও দেখার বিষয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে অধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-কর্মচারী ও তাদের পরিবারের তুলনায় ডাক্তারের সংখ্যা খুবই নগণ্য। এসব কারণে UMC তাদের খুব কমই সুযোগ-সুবিধা দিতে পারছে। UMC-এর কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায় যে, এখানে MBBS মানের চিকিৎসক রয়েছে তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলতে যা বোঝায় তা মাত্র ২ জন। ১ জন দন্ত ও আরেকজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ। এখানে মূলত আউটডোর চিকিৎসা দেয়া হয়। UMC-এর তৃতীয় তলায় ২৫ শয্যাবিশিষ্ট যে আবাসিক ওয়ার্ড রয়েছে তা মূলত চিকেন পক্সের রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত। ইতিপূর্বে চিকেন পক্স ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আবাসিক ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়নি। তবে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জন্ডিসের প্রকোপ হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ এবার বোধ হয় কিছুটা সচেতনতার পরিচয় দিচ্ছে। বিভিন্ন হলে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকার কারণে জন্ডিসে আক্রান্ত ছাত্রদের চিকিৎসার ব্যয়ভারও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বহন করছে। জন্ডিসে আক্রান্ত ছাত্রদের উপযুক্ত খাবার একুশে হল থেকে সরবরাহ করা হচ্ছে। কোনো কোনো ছাত্রের মতে, খাদ্যের মান ভালোই এবং ডাক্তাররাও আন্তরিক। তবে ৩০ বছর আগেকার যন্ত্রপাতির জায়গায় প্রয়োজন আধুনিক যন্ত্রপাতির, যদিও ১৯২৪ সালে মেডিকেলের out door ছোট একটি রুম নিয়ে এ UMC-এর যাত্রা শুরু। তবে দীর্ঘ সময় পেরিয়ে এই ২০০৪ সাল পর্যন্ত তা একটি পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল সেন্টারে পরিণত হতে পারেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনএক্স ভবনের পাশে তিন তলা বিল্ডিংয়ের ছোট্ট পরিসরের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ আছে। যদিও ৫ বছর আগে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল করার উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা যায়। তবে আজও তার কোনো নমুনা দেখা যাচ্ছে না।

weji“web cix¶vi Rb¨ i³ w`‡”Qb RwÛm Avµvš QvÎiv

বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারের চিকিৎসক ড. হারুনর রশিদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা এবং দক্ষ কর্মচারীর অভাবে এ মেডিকেল সেন্টারটির কোনো অগ্রগতি হয়নি। এ ছাড়া সরকার থেকে যে আর্থিক সহযোগিতা পাওয়া যায় তার সদ্ব্যবহার ঠিকভাবে হচ্ছে কি না সে প্রসঙ্গে তিনি কিছু বলতে নারাজ। UMC-এর প্রধান মেডিকেল অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ড. জাহানারা বেগমকে UMC-এ ডাক্তারসহ অন্যান্য কর্মচারীর উদাসীনতা অথবা তাদের কি কি ক্ষেত্রে অসুবিধা রয়েছে জানতে চাইলে এর উত্তরে তিনি বলেন যে, এ প্রসঙ্গে তাদের বলার কিছু নেই এবং তা বিশ্ববিদ্যালয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষই ভালো বলতে পারবেন এবং আগামী ৮ ডিসেম্বর ভিসি প্রো-ভিসির সঙ্গে তাদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এবং তার পরই তারা সে সম্পর্কে বলতে পারবেন। ২০০০ থেকে তাকে প্রশ্ন করা হলো যে, সরকার থেকে তারা কেমন সাহায্য-সহযোগিতা পাচ্ছে- এর উত্তরে তিনিসহ আরো কয়েকজন ডাক্তারের মন্তব্য হলো, এ সম্পর্কে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কমিটির চেয়ারম্যান আ.ফ.ম ইউসুফ হায়দারকে জিজ্ঞাসা করলেই বোধ হয় সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে। দেখা যাচ্ছে যে এ ক্ষেত্রে কেউই ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করার ইচ্ছাই রাখে না। যাই হোক বিশ্ববিদ্যালয় UMC-এর উন্নতি সকলেরই কাম্য। এই মেডিকেল সেন্টারে ডাক্তার এবং কর্মচারী মিলিয়ে জনবল রয়েছে প্রায় ৯০ জন। এদের বার্ষিক বেতন-ভাতা বাবদ সরকারের খরচ হচ্ছে ১ কোটি টাকা। এছাড়া অ্যালোপ্যাথি ওষুধ ও চিকিৎসার জন্য বার্ষিক ১ কোটি ২২ লাখ এবং হোমিও চিকিৎসা বাবদ খরচ করা হয় ৬ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

এই মেডিকেল সেন্টারটির ২২ জন চিকিৎসকের মধ্যে অনেকেই নিয়মিত চিকিৎসা দেন না এ রকম অভিযোগ সবার মুখেই শোনা যায়। এই মেডিকেল ৬ জন নার্স কর্মরত আছেন কিন্তু রিপোর্ট করার জন্য তিন দিন তিন বার গিয়ে তাদের কাউকেই চোখে পড়েনি।

ডাক্তার, নার্স এবং কর্মচারী সবার মধ্যেই যেন এক রকম উদাসীন ভাব। যার যেমন ইচ্ছা আসছেন যাচ্ছেন, চিকিৎসা দিচ্ছেন অথবা দিচ্ছেন না। আবার অ্যালোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকের মধ্যে সব সময় একটা বিরোধ লেগেই থাকে। ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী এবং তাদের পরিবার মিলিয়ে ৫০ হাজার মানুষের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র এই মেডিকেল সেন্টারটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে এভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। এ খাতে বছরে সোয়া ২ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে অথচ তার সুফল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকগণ কমই পাচ্ছেন।

সংরক্ষিত মহিলা আসন

প্রার্থীরা ব্যস্ত লবিং-এ

সদ্য সমাপ্ত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে বহু প্রতীক্ষিত মহিলা আসন সংরক্ষিত বিল পাস হয়েছে। সরাসরি নির্বাচনের দাবিকে উপেক্ষা করেই রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংসদের আসনের ভিত্তিতে এ বিল পাস হয়েছে। এ আইনের ফলে সংসদে ৪৫টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। হিসাবে দেখা যাচ্ছে সংসদে বিএনপি ২৯টি, আওয়ামী লীগ ৯টি, জামায়াত ৩টি, জাতীয় পার্টি (এরশাদ) ২টি, জাতীয় পার্টি মঞ্জুর, ইসলামী ঐক্য জোট, বিকল্পধারা, কৃষক শ্রমিক লীগ, স্বতন্ত্র প্রার্থী মিলে ২টি আসন পাবে।

সংবিধানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে যে, বিল পাসের ৪৫ দিনের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করার। এ কারণে আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের পদ পূরণ করতে হবে। এ কারণে ব্যস্ত এখন প্রার্থীরা। তবে সংসদে মহিলা আসন পেতে বিএনপির মন্ত্রী, সংসদ, ব্যবসায়ীর স্ত্রীরা জোর লবিং শুরু করেছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আইন মন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদের স্ত্রী হাসনা মওদুদ, তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ড. মঈন খানের স্ত্রী অ্যাডভোকেট রোখসানা খন্দকার, পানি সম্পদ মন্ত্রী মেজর (অবঃ) হাফিজ উদ্দিন আহমেদের স্ত্রী অধ্যাপিকা দিলারা হাফিজ, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশারফ হোসেন শাহাজাহানের স্ত্রী অধ্যাপিকা ফিরোজা বেগম, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ওবায়েদুর রহমানের স্ত্রী অধ্যাপিকা শাহেদা ওবায়েদ, এফবিসিআই প্রেসিডেন্ট আব্দুল আউয়াল মিন্টুর স্ত্রী নাসরিন আউয়াল, নিটল গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুল মতলুব আহমেদের স্ত্রী সেলিমা আহমেদ জোর লবিং শুরু করেছেন। এছাড়া হৃদরোগ বিশেজ্ঞ ও সমাজ সেবক অধ্যাপিক হাসিনা বানুও একজন সক্রিয় প্রার্থী। যোগ্য প্রার্থী হিসেবে নীতি নির্ধারকদের তার প্রতি দৃষ্টি রয়েছে। সাবেক ছাত্রদল নেত্রী হেলেন জেরিন খান, সাবেক সংসদ সদস্য রওশন আরা হেনা, যুবদল নেত্রী শিরিন সুলতানা, সারোয়ারী রহমান রোজী, রেহানা আক্তার বানু, নাভিলা চৌধুরী, সাবেক এমপি শাহিনা খানও গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থী।

আওয়ামী লীগ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত বিলটির বিরোধিতা করেছে। তারা সরাসরি নির্বাচন চেয়েছে। তবে আওয়ামী লীগের সূত্র জানিয়েছে, তারা সংরক্ষিত মহিলা আসনের কোটায় প্রাপ্ত সিটগুলোতে প্রার্থী দেবে। এ কারণে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরাও ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। বিভিন্নভাবে নেত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। আওয়ামী লীগের ৯ আসনের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, সাবেক কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, রাশেদা মহিউদ্দিন, বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান, অধ্যাপিকা হামিদা খানম,

অধ্যাপিকা নাজমা রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সুলতানা শফি, অভিনেত্রী তারানা হালিম, সেগুফতা এমিলি, মেহের আফরোজ চুমকি, রওশন জাহান সাথী, অপু উকিল, শাহিদ মনোয়ার হক, ভারতী নন্দী, যুব মহিলা লীগ প্রার্থী নাজমা আক্তার, মুন্নুজান সুফিয়ান রয়েছেন।

জাতীয় পার্টির সূত্র জানিয়েছে, সংরক্ষিত মহিলা আসনে সংসদ সদস্য হতে পার্টির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে। পার্টির নয়া প্রেসিডিয়াম সদস্য বিদিশা এরশাদ, রাজিয়া ফয়েজ, লিলি ইসলাম, অধ্যাপিকা মাসুদা এম. করিমের নাম পার্টির বিবেচনায় রয়েছে। তবে বিদিশা এরশাদ সংসদ সদস্য হচ্ছেন এ ব্যাপারে সবাই নিশ্চিত।

সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থিতা নিয়ে পার্টির মহিলা নেত্রীরা এখন সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তবে নারী সংগঠনগুলো এখন এ বিলের বিরোধিতা করছেন। তারা আইনি লড়াইয়ে যেতে পারেন। তবে জনগণ চায়, পার্টির মন্ত্রী, এমপি, নেতার স্ত্রী হয়ে নয়, পার্টির ত্যাগী নেত্রীদেরই সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাংসদ করা হোক

জাতীয় পার্টি (মঞ্জু) চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর স্ত্রী তাসমিমা হোসেন মহিলা আসনে সাংসদ হতে জোর লবিং শুরু করেছেন। জামায়াতে ইসলামের প্রার্থী হচ্ছেন শিল্পমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামীর স্ত্রী শামসুন্নাহার নিজামী, সাবেক এমপি হাফেজা আজমা খান, আনোয়ারা বেগম। তবে জাতীয় পার্টি-মঞ্জুর, বিকল্প ধারা, কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ একজন প্রার্থী নির্বাচনের চেষ্টা করেছে। স্বতন্ত্র ৪ সাংসদ মিলে একজন প্রার্থী দিতে পারবে। তবে তারা এখন তা চূড়ান্ত করেনি। জানা গেছে, ইসলামী ঐক্যজোট কোনো মহিলা সাংসদের জন্য প্রার্থী দেবে না।

কার্যত সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থিতা নিয়ে পার্টির মহিলা নেত্রীরা এখন সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। তবে নারী সংগঠনগুলো এখন এ বিলের বিরোধিতা করছেন। তারা আইনি লড়াইয়ে যেতে পারেন। তবে জনগণ চায়, পার্টির মন্ত্রী, এমপি, নেতার স্ত্রী হয়ে নয়, পার্টির ত্যাগী নেত্রীদেরই সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাংসদ করা হোক। তারা যেন দেশের নারীর স্বার্থ দেশের স্বার্থে সংসদে গিয়ে কথা বলতে পারেন।

জয়ন্ত আচার্য

ভারতীয় দলের সফর এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি

ইসলামী মৌলবাদীদের নামে পাঠানো এক ফ্যাক্সবার্তার প্রেক্ষিতে ভারতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনে পাঠানো হাতে লেখা বার্তায় বলা হয়েছে, ভারতীয় দল বাংলাদেশে এলে সব খেলোয়াড়কে হত্যা করা হবে। সংগঠনটি নিজেদের পরিচয় দিয়েছে 'হরকাতুল জিহাদ'।

বহির্বিশ্বে এমনিতেই বাংলাদেশ ইমেজ সংকটে ভুগছে। দেশী-বিদেশী নানা মহল সুযোগ পেলেই বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করে। বাংলাদেশকে ইসলামী জঙ্গিবাদীদের ঘাঁটি হিসেবে তুলে ধরার কোনো চেষ্টা তারা বাদ রাখে না। সাম্প্রতিক ফ্যাক্সবার্তা এবং ফলশ্রুতিতে ভারতীয় দলের সফর বাতিল বাংলাদেশের নেতিবাচক ইমেজে আরো খানিকটা প্রলেপ লাগিয়ে দেবে।

বিশেষত, ভারতীয় মিডিয়ার হাতে আরেকটি ইস্যু এসে গেলো। এর আগে বিদেশী পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশে ইসলামী মৌলবাদের উত্থান এবং বিস্তার নিয়ে যতগুলো মনগড়া রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, তার সবগুলোর পেছনে ভারতীয় প্রচারমহলের হাত ছিলো। ভারতীয় প্রচারমহল বাংলাদেশকে একটি মৌলবাদী দেশ হিসেবে পশ্চিমা দেশের কাছে তুলে ধরতে আদা-জল খেয়ে লেগেছে। মৌলবাদী হুমকির প্রেক্ষিতে একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান বাতিল করা হলে বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহল গুরুত্বের সঙ্গে নেবে। স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় মিডিয়ায় 'মৌলবাদী হুমকির' ব্যাপারটি বেশ ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে।

এখন প্রশ্ন হলো, ফ্যাক্সবার্তাটি পাঠালো কে? বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করার। তবে পার্থ সাহার ই-মেইল হুমকির কথা মনে রেখে অনেকেই ব্যাপারটির মধ্যে 'ইয়াকি'র গন্ধ পাচ্ছেন। কিন্তু একটি বিদেশী ক্রিকেট দলের প্রতি হুমকির ঘটনাকে, হোক সেটা 'ইয়ার্কি' তা হালকাভাবে নেয়ার জো নেই। ফ্যাক্সবার্তা প্রেরককে যত দ্রুত সম্ভব গ্রেপ্তার করে জনসম্মুখে আনতে হবে। কাজটি দ্রুততার সঙ্গে করা প্রয়োজন। কেননা দিন যত যাবে, ভারতীয় প্রপাগান্ডা মেশিনের আওয়াজ ততই বাড়তে থাকবে।

ক্রীড়ামোদী বাংলাদেশীদের একটা বড় অংশ ভারতীয় ক্রিকেট দলের সমর্থক। তারা চায় সৌরভরা এখানে আসুক এবং সিরিজ খেলুক। কারো সফর বাতিল হোক এটা অনাকাঙ্ক্ষিত। পাশাপাশি এধরনের উড়ো হুমকিকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হোক এটাও কেউ আশা করে না। সরকার এখন কতদূর কী করে সেটাই দেখার বিষয়।

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম

ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪

‘প্রয়োজন হলে পাঠ্যপুস্তক দুর্নীতি রোধে র‌্যাব নামানো হবে’

আ ন ম এহছানুল হক মিলন

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

webvg‡j¨ cvV¨c¯K weZi‡Yi †¶‡Î GK ai‡bi µvB‡gi K_v e‡j‡Qb wk¶v cwZgš¿x| G‡`i ai‡Z wZwb e× cwiKi| mvßvwnK 2000†K GnQvbj nK wgjb Rwb‡q‡Qb cvV¨c¯K cKvkbv I weZi‡Yi me‡kl Ae¯vi K_v... mv¶vrKvi wb‡q‡Qb e`i“‡ÏvRv eve

সাপ্তাহিক ২০০০ : খোলাবাজারে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিক্রি প্রতিরোধে র‌্যাব নামানো হবে- এই খবরের সত্যতা কতটুকু?

আ ন ম এহছানুল হক মিলন : পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রে এক ধরনের ক্রাইম হয়। কিছু এলিট গ্রুপ অব পিপল এই ক্রাইমটা করে। এদের ধরার জন্য দরকার এলিট ফোর্স। র‌্যাব হচ্ছে সেই এলিট ফোর্স। এদের স্পেশাল মিশন দেয়া হয়। এটা কোনো সাধারণ ক্রাইম নয়, হোয়াইট কালার ক্রাইম। পুলিশের চোখকে তারা সহজেই ফাঁকি দিতে পারে। অন্যান্য দায়িত্ব নিয়ে পুলিশ ভীষণ ব্যস্ত থাকে। ফলে এই ক্রাইমের ক্ষেত্রে তারা ততটা মনোযোগী হতে পারে না। কাগজের এই ক্রাইম বুঝতে হলে পুলিশকে অনেক সময় দেয়া লাগবে। পুলিশের এত সময় নেই। বই নকল করে বিক্রি করা, নোট বই ছাপানো এটা বহুদিন ধরে আমাদের দেশে চলে আসছে। বিগত দিনগুলোতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছি এগুলো বন্ধ করতে। অনেকটা পেরেছি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে পারিনি। তাই এবার ভাবলাম, যদি আমরা কোনো অবস্থায় ব্যর্থ হই তাহলে র‌্যাব নামাবো।

২০০০ : এই ‘যদি ব্যর্থ’ হবার সম্ভাবনা কতটুকু?

এহছানুল হক : আশা করছি অনেকাংশে আমরা পারবো।

২০০০ : আসলে সমস্যাগুলো এখনো কোথায় রয়ে গিয়েছে?

এহছানুল হক : মূল সমস্যা হলো, বাংলাবাজারে এখনো বই পাইরেসি করা হয়, নকল বই বিক্রি করা হয়।

২০০০ : এর প্রতিরোধে মন্ত্রণালয় কি ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে?

এহছানুল হক : আমরা বোর্ড থেকে যে বই ছাপাচ্ছি সেখানে এনসিটিবি'র অ্যামবুশ করা কাগজ দিচ্ছি এবং প্রত্যেকটি বইয়ের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের সিকিউরিটি পেপার দিচ্ছি। এগুলো দিয়ে আমরা মূলত দুর্নীতিটা কমাতে চাচ্ছি। সরকার এখানে রয়্যালটি দিচ্ছে। যেকোনো লোক কম মূল্যের কাগজ দিয়ে একই বই প্রিন্ট করে বাজারজাত করলে বেশি লাভবান হতে পারে। তাহলে সরকারের যে কন্ডাকটর আছে তাদের টাকা লোকসান হয়।

২০০০ : এখানে তো আপনি শুধু পাইরেসির কথা বললেন, কিন্তু আরেক ধরনের দুর্নীতি রয়েছে সেটা হচ্ছে স্কুলগুলোতে বিনামূল্যে যে বই পাঠানো হয় সেগুলো তারা ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে না দিয়ে খোলাবাজারে বিক্রি করে দিচ্ছে-এ ব্যাপারে কি ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে এ বছর?

এহছানুল হক : বাজারে যদি বিনামূল্যের বই মূল্যে বিক্রি হয়, তাহলে যে লাইব্রেরি বিক্রি করবে প্রথমে তাকে ধরবো। সে বলবে কোথা থেকে বইগুলো পেয়েছে। লাইব্রেরি বলতে না পারলেও আমরা খুঁজে বের করতে পারবো কোন জেলার বইগুলো সে বিক্রি করছে। বইয়ের সিরিয়াল নম্বর ধরে সহজেই তা বের করা যাবে। এই ক্রাইমটা বহুদিন ধরে আমাদের দেশে হচ্ছে। এই সংঘবদ্ধ দলকে সমূলে উৎপাটনের জন্য আমাদের প্রয়োজন এলিট ফোর্স। সে জন্যই আমরা এবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করবো, এ ধরনের ক্রাইম বন্ধে র‌্যাবকে নামানোর জন্য।

২০০০ : বাণিজ্যমন্ত্রীও বাজারে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে র‌্যাব নামিয়েছেন এ ক্ষেত্রে র‌্যাবের সফলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সন্ত্রাসীকে ধরতে তাদের ‘ক্রসফায়ার’ যতটুকু ভীতি তৈরি করেছে... এ ক্ষেত্রে কি সেটা পারবে?

এহছানুল হক : র‌্যাব হচ্ছে স্পেশাল ফোর্স। তাদের সন্ত্রাস দমনের জন্য নামানো হয়েছে এবং ইতিমধ্যে তারা সফলতাও অর্জন করেছে। আমি মনে করি র‌্যাবকে যদি সময় দেয়া হয় তাহলে তারা যে কোনো ধরনের দুর্নীতি দমনে সাফল্য পাবে। পাঠ্যপুস্তকের এ ধরনের ক্রাইমেও তারা সফল হবে বলে আমি

মনে করি।

সাপ্তাহিক ২০০০ : এবারকার পাঠ্যপুস্তক বিতরণ সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি। সময়মতো কি পৌঁছাবে শিক্ষার্থীদের হাতে?

এহছানুল হক : অন্যবারের তুলনায় এবার আমরা আরো একটু বেশি এগিয়ে আছি। অবশ্য প্রতিবারের মতো এবারও আমাদের প্রতিবন্ধকতা ছিলো। কিন্তু...

২০০০ : সেই প্রতিবন্ধকতার একটি মনে হয় কার্যাদেশ নিয়ে সমস্যা ছিলো?

এহছানুল হক : মূলত এনসিটিবি দেখার দায়িত্ব আমার। কিন্তু মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী হচ্ছে আমাদের সবার ওপরে। অতএব তিনি যেকোনো সময় যেকোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। প্রোকিউরমেন্ট রুল নিয়ে একটি জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিলো। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ, শিক্ষার্থীদের হাতে বই সময় মতো পৌঁছাতে হবে। সেটাই আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি।

২০০০ : মাধ্যমিক পর্যায়ে কিছু বই বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়ার কথা হচ্ছেন এবং এ বছরই কয়েকটি বই বাজারে আসার কথা।

এহছানুল হক : মাধ্যমিক পর্যায়ের ৭টি বই এ বছর বেসরকারি খাতে দেয়ার চিন্তা-ভাবনা করছি।

আমরা মূলত চাচ্ছি বইপত্র প্রিন্টিং সংক্রান্ত কাজ বেসরকারি খাতে ছেড়ে দিতে। তাহলে প্রতিযোগিতার কারণে মানসম্মত বই বের হবে এবং বাজার দরও নিয়ন্ত্রিত হবে। এ বছর মাধ্যমিকের ৭টি বই দিয়ে শুরু হচ্ছে। আগামী বছরে ৩৫টিকে, পর্যায়ক্রমে সবগুলোকে আমরা বেসরকারি উদ্যোক্তাদের হাতে দিয়ে দেবো। এতে সরকারের নিয়ন্ত্রিত হতে হবে না আর মূল্য আমরা নির্ধারণ করে দেবো। অর্থাৎ সবগুলো বিষয়ের ওপর কয়েকটি করে বই থাকবে আর শিক্ষার্থী তার পছন্দমতো বইটি পড়তে পারবে। উদ্যোক্তারা পাণ্ডুলিপি আমাদের কাছে জমা দেবে। আমাদের কারিকুলামে পড়লে তা অনুমোদন দেবো।

২০০০ : এ বছর আপনার যে ৭টি বই বেসরকারি খাতে দেবেন তার কাজের অগ্রগতি কতটুকু? শোনা যাচ্ছে, সময়মতো নাকি শিক্ষার্থীদের হাতে এ বইগুলো পৌঁছাবে না?

এহছানুল হক : পাণ্ডুলিপির কাজ চলছে। আশা করছি সময়মতো দিতে পারবো, যদি না সম্ভব হয় তাহলে পুরনো বই তো রয়েছেই আমাদের হাতে।

২০০০ : কিন্তু এ ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলো হতে পারে সে ব্যাপারে আপনারা কি চিন্তা-ভাবনা করেছেন?

এহছানুল হক : আসলে নতুন পদ্ধতি চালু করতে গেলে সমস্যা তো থাকবেই। প্রক্রিয়ার মধ্যে ঢুকে যাবার পর সমস্যাগুলোর সমাধান

বাজারে যদি বিনামূল্যের বই মূল্যে বিক্রি হয়, তাহলে যে লাইব্রেরি বিক্রি করবে প্রথমে তাকে ধরবো। সে বলবে কোথা থেকে বইগুলো পেয়েছে। লাইব্রেরি বলতে না পারলেও আমরা খুঁজে বের করতে পারবো কোন জেলার বইগুলো সে বিক্রি করছে। বইয়ের সিরিয়াল নম্বর ধরে সহজেই তা বের করা যাবে। এই ক্রাইমটা বহুদিন ধরে আমাদের দেশে হচ্ছে। এই সংঘবদ্ধ দলকে সমূলে উৎপাটনের জন্য আমাদের প্রয়োজন এলিট ফোর্স

করা সম্ভব হবে।

২০০০ : এ ক্ষেত্রেও তো দুর্নীতি হতে পারে। কারণ কোন স্কুল কোন বই পড়াবে কিংবা তাদের শিক্ষার্থীকে কোন বইটি কিনতে বলবে সেটা নির্ধারণের ক্ষেত্রে তারা বেসরকারি বই প্রকাশকদের কাছ থেকে দুর্নীতির শিকার হতে পারে?

এহছানুল হক : দুর্নীতি হবে এটা আমরা চাই না। দুর্নীতি করার জায়গাও রাখতে চাই না। আমরা প্রথমত দেখবো আমাদের সিলেবাস কারিকুলামের ভেতর সুন্দর ও মানসম্মত বই হলো কিনা/ যে বইগুলোকে আমরা অনুমোদন দেবো সেগুলো নিশ্চয়ই শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটাবে। আর আমরা বইয়ের দাম নির্ধারণ করে দেবো তারপর যদি মার্কেটে বিক্রির প্রতিযোগিতা হয় সে ক্ষেত্রে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু আবারও বলছি আমরা বইটির এমন দাম নির্ধারণ করবো যাতে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

২০০০ : একটি অভিযোগ আছে, জেলা শহরগুলোতে প্রাথমিক শ্রেণীর বই পৌঁছে গেলেও প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছাতে সময় লাগে আরো এক-দুই মাস। অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি, মার্চ লেগে যেতে পারে।

এহছানুল হক : কোনো বই শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছাতে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস হয়নি। ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই আমরা বইগুলো উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে দিই। শিক্ষা অফিসারের দায়িত্ব বইগুলো পৌঁছে দেয়া। যদি তারা ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের ব্যাপারে আমরা এবার ব্যবস্থা নেবো। অতএব কোনো অবস্থায় সে সুযোগ নেই। প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে দুই-এক সপ্তাহ বেশি সময় লাগতে পারে। কিন্তু কোনোক্রমে শিক্ষার্থীরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে জন্য এবারের ব্যবস্থা আরও বেশি কড়াকড়ি হবে।